কর্মযোগী বিজ্ঞানী — আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় হলেন ভারতবর্ষের আধুনিক রসায়নের জনক। তাঁকে ভারতবর্ষের রাসায়নিক শিল্পের পুরোধা বললেও অত্যুক্তি হবে না। রসায়নে তাঁর অবদান আজ সর্বজনবিদিত। বিজ্ঞানী হয়েও তাঁর কাজ যে কেবলমাত্র গবেষণা ও শিক্ষকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, বিভিন্ন সমাজ - সংস্কারমূলক কাজেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিশেষত শিক্ষার সংস্কার, শিল্পের উন্নতি, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং রাজনৈতিক উন্নতির প্রতি ছিল তাঁর সতর্ক দৃষ্টি।

প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম ১৮৬১ সালের ২রা আগস্ট বাংলাদেশের খুলনার রাড়ুলি গ্রামে। পিতা হরিশচন্দ্র ছিলেন স্বাধীনচেতা মানুষ। ফারসি, ইংরাজী, সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। মা ভুবনমোহিনী দেবীও ছিলেন উচ্চচিন্তাশীলা নারী। প্রফুল্লচন্দ্রের প্রাথমিক পড়াশোনা শুরু হয়েছিল তাঁর গ্রামেই বাবার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে। কিন্তু হরিশচন্দ্র পুত্র প্রফুল্লকে ১৮৭০ সালে পাকাপাকিভাবে কলকাতায় নিয়ে চলে আসেন প্রধানত পড়াশোনার জন্যই। ১৮৭১ সালে প্রফুল্লচন্দ্র হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু এই স্কুলে তিনি বেশি দিন পড়াশোনা করতে পারেননি। শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁকে ঐ স্কুল ছেড়ে দিতে হয় এবং প্রায় দুবছর তাঁর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ঐ দুবছর সময়ে তিনি ইংরাজী সাহিত্য ও বাংলার ঐতিহাসিক রচনাগুলি পড়তে শুরু করেন। প্রফুল্লচন্দ্র পরে লিখেছেন। - ''I was voracious devourer of books and when I was barely 12 years old, I sometimes used to get up at 3 or 4'clock in the morning so that I might pore over the contents of a favourite author without disturbance.''

১৮৭৪ সালে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্রের অ্যালবার্ট স্কুলে পড়াশোনা শুরু করেন। ১৮৭৯ সালে তিনি সেখান থেকে entrance পরীক্ষায় পাশ করেন। এরপর পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন কলেজে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) F. A তে ভর্তি হন। তখন রসায়ন F. A তে অবশ্যপাঠ্য বিষয় ছিল। প্রফুল্লচন্দ্র বহিরাগত ছাত্র হিসাবে প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার দুটি ক্লাসই করতেন। এখানেই তিনি আলেকজান্ডার পেডলারের সংস্পর্শে আসেন এবং রসায়নের প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, তিনি এবং তাঁর এক বন্ধু মিলে একটা ছোট laboratory বানিয়েছিলেন, সেখানে তাঁরা ক্লাসে দেখা পরীক্ষাগুলি নিজেদের হাতে করতেন। একবার হাইড্রোজেন - অকসিজেন শিকা তৈরি করতে গিয়ে বড় বিস্ফোরণ হয়েছিল, সেবার তাঁরা খুব জোর দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচেছিলেন।

পিতা হরিশচন্দ্রের ইচ্ছানুযায়ী প্রফুল্লচন্দ্র গিলক্রিস্ট স্কলারশিপ নিয়ে ইংলন্ডের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে রওনা হন ১৮৮২ সালে। তখন জগদীশচন্দ্র বসু কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছিলেন। জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্রকে সাদরে অভ্যর্থনা জানান। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফুল্লচন্দ্র B.sc. ক্লাসে ভর্তি হন। ১৮৮৯ সালে তিনি B.sc. ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল। - ''Conjugated sulphates of copper - Magnesium group : A study of Isomerphous mixtures and Molecular Combination.'' তিনি এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের Chemnical Society -এর Vice-president নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৮৮৭ সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় তাকে D.sc. সম্মানে ভূষিত করে। পরবর্তীকালে ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যথাক্রমে ১৯১২ ও ১৯৩৩ সালে সাম্মানিক D.sc ডিগ্রি প্রদান করে।

ছয় বছর বিদেশে কাটানোর পর ১৮৮৮ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু সেই সময়ে ভারতবর্ষে রসায়ন নিয়ে গবেষণা ছিল একেবারেই শিশু পর্যায়ে। প্রায় একবছর পর ১৮৮৯ সালে ২৫০ টাকার মাসিক বেতনে প্রেসিডেন্সি কলেজে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে যোগদান করেন। ১৯১৬ সালে রসায়ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসাবে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর নেন। এরপর ১৯১২ সালে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-এর অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করেন। তিনিই ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম 'পালিত প্রফেসর'। আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন গবেষণামূলক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান হল তিনিই প্রথম (১৮৯৬) মারকিউরাস নাইট্রাইট যৌগটির অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। তখনও পর্যন্ত এই যৌগটির কথা জানা ছিল না। এই আবিষ্কার তাঁকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দেয়। তাঁর এই কাজ প্রথম প্রকাশিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটির একটি পত্রিকায় যা পরে বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা ''Nature'' -এক নজরে আসে। তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হল তিনিই প্রথম বিশুদ্ধরূপে (in pure form) অ্যামেনিয়াম নাইট্রাইট সংশ্লেষ করেন। এছাড়াও তিনি সোনা, প্লাটিনাম, ইরিডিয়াম প্রভৃতি মৌলের মারকাপ্টাইল ও জৈব সালফাইড যৌগের উপর মৌলিক কাজ করেন যার অনেকগুলি Journal of Indian Chemical Society -তে প্রকাশিত হয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অত্যন্ত সাধারণভাবে জীবনযাপন করতেন। বিজ্ঞান কলেজের একটি ছোট্ট ঘরে তিনি থাকতেন। ঘরটিও ছিল অত্যন্ত সাধারণ—একটি বিছানা, টেবিল, চেয়ার ও বই -এ ঠাসা একটি আলমারি ছিল তাঁর সঙ্গী। তাঁর

ব্যবহার্য জিনিসসহ এগুলিও বিজ্ঞান কলেজে তাঁর ঘরটিতে আজও সযত্নে রাখা আছে। মহাত্মা গান্ধী তাঁর সাধারণ জীবনযাত্রা দেখে বিস্ময়ের সঙ্গে বলেছিলেন— 'It is difficult to believe that the man in simple Indian dress wearing simple manners could possibly be the great scientist and professor.'

প্রফুল্লচন্দ্রের বিখ্যাত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ- 'Life and Experiences of a Bengali Chemist' শুধুমাত্র তাঁর জীবনের ঘটনাপঞ্জীই আমাদের জানায় না, বরং একটি তৎকালীন বাংলা ও ভারতবর্ষের বিজ্ঞানচেতনার একটি প্রামাণ্য দলিল। এই আত্মজীবনীর মুখবন্ধে প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছেন— 'While a student at Edinburgh I found to my regret thet every civilized country including japan was adding to the world's stock of knowledge but that unhappy India was lagging behind. I dreamt that god willing a time would come when she too would contribute her quota. Half a century since then rolled by. My dream I have now the gratification of finding fairly materialised. A new era has evidently dawned upon India. Her sons have taken kindly to the zealous persuit of different branches of science. May the torch Thus kindled burn with greater brilliance from generation to generation.'

বিদেশে পড়াশোনা এবং ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকরি করলেও প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন মনে - প্রাণে স্বদেশী। কলকাতায় গান্ধীজীকে আনার জন্য তিনিই প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বিজ্ঞানী হয়েও তিনি বলেছিলেন 'Science can wait bur Swaraj connot.'. সঙ্গে এক কথোপকথনের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে পরবর্তীকালে তিনি লিখেছেন- 'The frequent conversation which I used to have with Gandhi made a deep and lasting impression on me..., 'I always make it a poont to travel third class in my railway journey so that I might be in close personal touch with the masses. Even after the lapse of thirty years these words still ring in my ears. Truth lived is a far greater force than truth merely spoken." প্রফুল্লচন্দ্র অনুধাবন করেছিলেন যে বাংলার উন্নতি ঘটাতে গেলে অর্থনৈতিক উন্নতি একান্ত প্রয়োজন এবং তা আসতে পারে বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্পের মাধ্যমে। তাই তিনি ১৮৯২ সালে বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্টাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড -এর কাজ শুরু করেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠার পিছনে তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের যুবকদের কর্মসংস্থান। প্রখ্যাত লেখক Sir John Comming শিল্পে বাংলার অবস্থান সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ১৯০৮ সালে লিখেছেন 'The Bengal Chemical and Pharmaceutical Works Ltd. in one of the most go-ahcad young enterprises in Bengal. Dr. Prafulla Chandra Roy, D.Sc., strated it as a small private concern in Upper Circular road about 15 years ago and made drugs from indigenous materisls. The latest development is in perfumes. The Enterprise shows Signs of resoursefulness & business capacity which would be an object lesson to capitalists of this province.'

প্রফুল্লচন্দ্রের সাহিত্যের প্রতিও যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। Shakespeare, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচনা তিনি প্রায়ই মুখস্ত বলতে পারতেন। আত্মজীবনী ছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হল - 'A History of Hindu Chemistry from the Earliest Times to the Sixteenth Century' যারপ্রথম সংখ্যা ১৯০২ এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটি ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয়। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর জীবনের সব উপার্জনই বিভিন্নভাবে দান করে গেছেন। ১৯২২ সালে তিনি রসায়নে ১০,০০০ টাকার বার্ষিক পুরস্কার ঘোষণা করেন। এছাড়া আশুতোষ মুখোপাধ্যায় -এর নামে ১৯৩৭ সালে প্রাণীবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যাতেও পুরস্কার ঘোষণা করেন। ১০০,০০০ টাকা তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন কেবলমাত্র রসায়ন বিভাগের উন্নতির জন্য। বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে তিনি কোনদিন বেতন নেননি। ১৯৪৪ সালের ১৬ই জুন বিজ্ঞান কলেজে তাঁর নিজের ঘরেই এই কর্মযোগী বিজ্ঞানীর মৃত্যু ঘটে।

বিজ্ঞানী ও শিক্ষক হয়েও তিনি কোনদিন গবেষণাগার বা ক্লাসঘরে আবদ্ধ থাকেননি। বারে বারে ছুটে গেছেন মানুষের কাছে। ১৯২৩ সালে উত্তরবঙ্গে এক ভয়ানক বন্যা হয়। সেই সময় তিনি Bengal Relief Committee তৈরি করেন এবং প্রায় ২০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে আর্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। সাফল্যের পরেও তিনি বলেছিলেন— 'I have no sense of success on any large scale in things achieved...but have the sense of having worked and having found happiness in doing so.' এই ত্যাগী মনীষীর জীবন বর্তমান যুবসমাজকে আরও উদ্বুদ্ধ করুক —এই প্রার্থনা।